জীবন-মরণ ন্যস্ত তার সম্মুখে ক্বিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। পরম পবিত্র মহা সত্তা আল্লাহ্‌র কাছে সন্তোষজনক জবাবদিহির জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস সীসাঢালা প্রাচীরের মত সুদৃঢ় হ'তে হবে। সকল প্রকার অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা বিদূরিত করতে হবে। নিজেদের খেয়াল খুশীমত জীবন যাপন পরিত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার মানব রচিত মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে হবে। অপরের প্রতি যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রাধান্য না দিয়ে পরকালের যিন্দেগীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা বন্ধ করতে হবে। পৃথিবীতে বিদ্যমান পুঁজিবাদ, সমাজবাদসহ সকল প্রকার মানব রচিত বিধানকে বাতিল করে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র শ্বাশত বিধান চালু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য, পদদলিত করে সেই মহাসত্তার ধ্যান-ধারণা ও ইচ্ছাকে নিঃশর্তভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। নতুবা হাশরের দিনে শেষ বিচারে আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবেনা। আজকের পর যেমন আগামীকালের আগমণ সুনিশ্চিত, ঠিক তেমনি দুনিয়ার যিন্দেগীর পর ক্বিয়ামত সুনিশ্চিত। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না' *(জাসিয়া ২৬)*।

ক্বিয়ামতের সেই কঠিন আযাব, আখেরাতে মুক্তি, আল্লাহ্‌র নৈকট্য-সান্নিধ্য লাভের বাসনা, নরকের ভয়াবহ শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ ও অনন্ত অসীম চিরকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অহি-র বিধান চালু ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীতে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিরোধ করতে হ'লে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের দিকেই এগুতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রদত্ত অভ্রান্ত অহি-র বিধানের পথে দৃঢ়ভাবে চলার তৌফিক দিন- এটাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম চাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' (লোকমান ৩৩)।।

মনীষী চরিত

আযীমুদ্দীন আল-আযহারী

(১৯০১-১৯৬৯ খৃঃ)

*-ডঃ ওমর ফারূক**

সংক্ষেপায়নেঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। বিশেষ করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে তিনি যে অতুলীয় অবদান রেখেছেন তা আন্দোলন প্রিয় যেকোন ভাইকে প্রেরণা যোগাবে বলে মনে করি। এ নিবন্ধে আমরা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও জন্মঃ

নাম মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম আযীমুদ্দীন। লক্বব আল-আযহারী। পিতার নাম রিয়াযুদ্দীন মণ্ডল। মাতার নাম তামসা খাতুন। তিনি রাজশাহী যেলার চারঘাট উপযেলাধীন বাদুড়িয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের দুমকা যেলার ইসলামপুর গ্রামে মাওলানা আয়েনুদ্দীন** ছাহেবের মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততিঃ

১৯২২ সালে তিনি উস্তাদ মাওলানা আয়েনুদ্দীনের জ্যেষ্ঠা কন্যা আকলীমা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯২৫ সালে যখন তিনি মিসর যাত্রা করেন, তখন তিনি একটি পুত্র সন্তানের পিতা এবং ঐসময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি মোট দুই পুত্র ও দুই কন্যার পিতা ছিলেন।

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাঃ

সে কালে প্রায় প্রতিবছর জামিরার মাওলানা যাকারিয়া

** ডাইরেকটর (অবঃ), সায়েন্স ল্যাবরেটরী, রাজশাহী। মরহূমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।*

*** মাওলানা আয়েনুদ্দীন একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজশাহী যেলার জামিরা গ্রামের মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের ওল্ড স্কীম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কিন্তু দেনা-পাওনা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দেন। অতঃপর স্বগ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলে পূর্ববাংলার কিছু তালেবুল এলেম তাঁর সাথে গমন করেন। মাওলানা আযীমুদ্দীন ছিলেন তাদের অন্যতম।*

ছাহেবের গ্রামে বার্ষিক জালসা ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হ'ত। প্রায় ৭দিন ধরে এ অনুষ্ঠান চলত। কথিত আছে যে, মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের পিতা মাওলানা মুহাম্মাদের সময় তাঁর মুরীদানের সর্বমোট জুম'আ মসজিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০। মসজিদের সংখ্যা থেকেই মুরীদানের সংখ্যা অনুমান করা যায়।

ঘটনাক্রমে মাওলানা আযীমুদ্দীন এরূপ কোন এক জালসায় উপস্থিত হন। নতুন তালেবুল এলেম হিসাবে তাঁকেও উক্ত জালসায় কিছু বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। মাওলানা আযীমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতার একপর্যায়ে এমনকি পীরগিরিকে ইসলাম পরিপন্থী কাজ বলে তিনি ফৎওয়া দেন। তাঁর বক্তব্যে মাওলানা যাকারিয়া হতভম্ব হয়ে যান এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সভামঞ্চেই তাঁকে ভর্ৎসনা করেন ও মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। বলা বাহুল্য যে, এটাই তাঁর জন্য শাপে বর হয়।

মাওলানা আযীমুদ্দীন উক্ত সভামঞ্চ থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, এমন প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করব, যার তুলনা বিরল। অতঃপর তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সংকল্প করেন। যা তার মত একজন বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য তদানীন্তন সময়ে একটি অলীক কল্পনা বৈ কিছুই ছিল না।

মিসরের পথে মাওলানা আযীমুদ্দীনঃ

জ্ঞান পিপাসু আযীমুদ্দীন স্ত্রী ও সন্তানদের মায়া ত্যাগ করে মিসর যাবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কোলকাতা রওয়ানা হন। কোলকাতা পৌঁছে হুগলী যেলার ব্যবসায়ী আফযাল হোসাইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। আফযাল হোসাইন সে বছর হজ্জ করতে মক্কা যান। আযীমুদ্দীন তার সঙ্গে মক্কা গিয়ে প্রথমে হজ্জ সম্পন্ন করেন। অতঃপর হজ্জব্রত পালন করে ১৯২৫ সালের কোন এক সময়ে মিসর গমন করেন। মিসর পৌঁছে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে দেশে সংবাদ দেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১১ বছরের ছাত্র জীবনের ৭-৮ বছরের খরচ তাঁর বড় ভাই মুহাম্মাদ আব্দুশ শুকূর এবং শ্বশুর মাওলানা আয়েনুদ্দীন যৌথভাবে বহন করেন। শেষ ৩-৪ বছরের খরচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করে।

মেধাবী ছাত্র আযীমুদ্দীনঃ

সে সময় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫০ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করত। আযীমুদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ক্লাসে তিনি সবসময় প্রথম হ'তেন। একজন মিসরীয় ছাত্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষায়ও আযীমুদ্দীন প্রথম স্থান অধিকার করেন। আর ঐ মিসরীয় ছাত্রটি ২য় স্থান অধিকার করে। এতে ঐ ছাত্রটি ক্ষুব্ধ ও মারমুখো হয়ে ওঠে। লেখাপড়ার শেষ পর্যায়ে মিসরীয় এক ভদ্রলোকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তিনি আযীমুদ্দীনকে দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। এদিকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর পরীক্ষার ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন মিসরীয় ৮০০ টাকায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ দিন দেশ ত্যাগের বেদনা এবং প্রাণের ভয়ে তিনি মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনঃ

দীর্ঘ ১১ বছরের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ১৯৩৬ সালের কোন এক সময়ে আযীমুদ্দীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজস্ব মালামাল এবং বহু মূল্যবান কিতাব সঙ্গে আনতে পারেননি।

কর্মজীবনঃ

কর্মজীবনের শুরুতেই জনাব আযীমুদ্দীন মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পান। কিন্তু সংস্কারমনা আযীমুদ্দীন সুদূর মিসরে অধ্যাপনা না করে দেশেই ফিরে আসেন। দেশের অশিক্ষিত সমাজকে সুশিক্ষিত করার মানসে তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এর মধ্যে পাবনা যেলার কৃষ্ণপুর মাদরাসা, রাজশাহী যেলার ভায়ালক্ষ্মীপুর ও চর আলাতুলী মাদরাসা, দিনাজপুর যেলার আকরগ্রাম মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আদর্শ শিক্ষক মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারীঃ

মাওলানা আযীমুদ্দীন ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষক। সময়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ছাত্রদের সঠিক শিক্ষাদানই ছিল তাঁর মহান ব্রত। অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি সাধারণত ক্লাস বর্জন করতেন না। অন্যান্য শিক্ষকদের ক্লাসের প্রতিও বিশেষ নযর রাখতেন তিনি। কোন ছাত্রের পক্ষে পড়া ঠিক না করে ক্লাসে আসা ছিল বিপদজনক।

১৯৫০ সালের ঘটনা। তিনি তখন পাবনার কৃষ্ণপুর মাদরাসার শিক্ষক। তাঁর বড় ছেলে ঐ মাদরাসারই ছাত্র। একদিন ক্লাসে তিনি পড়া ধরলে কোন ছাত্রই সঠিক ভাবে পড়া শুনাতে পারেনি। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে সকল ছাত্রকেই বেদম প্রহার করেন। সবশেষে নিজ ছেলের পালা। তিনি ধারণা করেছিলেন ছেলে নিশ্চয়ই পড়া পারবে। কিন্তু না। ছেলেও সেদিন পড়া ঠিক করে আসেনি। হতাশ হ'লেন মাওলানা আযীমুদ্দীন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুরো ক্লাস সেদিন নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিনের পর থেকে সকল ছাত্রই পড়া ঠিক করে ক্লাসে আসত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেন, সেদিনের সেই প্রহার সারা জীবন আমাকে লেখাপড়া করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। যখনই লেখাপড়ায় অলসতা আসত তখনই চোখের সামনে পিতার বেত হাতের রণমূর্তি ভেসে উঠত।

শিক্ষক হিসাবে এই কঠিন হৃদয় মানুষটিই পিতা হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত কোমল। এই ঘটনার দিন সন্ধ্যায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। পিতা ছেলের জামা খুলে দেখেন পাঁচটি বেতের বাড়ির আঘাতে পাঁচটি লম্বা ক্ষতের

সৃষ্টি হয়েছে। মাওলানা আযহারী নিজে সেই ক্ষতে মলম লাগাচ্ছেন আর চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। ছেলেও কাঁদছে। তাঁর হাতে গড়া আলেমদের প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁর হাতের বেতের বাড়ি কোন আঘাত নয় বরং এক একটি দাগ শিক্ষার এক একটি আলোকবর্তিকা ছিল।

'কু আনফুসাকুম ওয়া আহলীকুম না-রা' 'নিজে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচ এবং নিজ পরিবারকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬)*। আল্লাহপাকের এই অমোঘ নির্দেশ পালনে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। নিজ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও আহালদের ধর্মকর্ম পালনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতেন। একদিন এক মুছল্লী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওমর ফারূক সম্বন্ধে কলের গান শুনার নালিশ করলে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে ডাকেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কলের গান শুনেছ? ছেলে ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ শুনেছি। তিনি তখন মুছল্লীদের সামনেই ছেলেকে চূড়ান্ত শাসন করেন এবং এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আস্ত রাখবে না বলে ভয় দেখান। অতঃপর সবার সামনে ছেলেকে তওবা পড়ান। এ ঘটনা উপস্থিত মুছল্লীদের অভিভূত করে।

ছাত্রবৃন্দঃ

বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর ইলমের ভাণ্ডার দেশের অগণিত জ্ঞান পিপাসু ছাত্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মৌচাক থেকে মধু আহরণের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। যাদের অনেকে এখনও বেঁচে থেকে দ্বীনী অঙ্গনে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা দাউদ, মাওলানা জালালুদ্দীন, মাওলানা কফীলুদ্দীন, মাওলানা সিরাজুদ্দীন ও মাওলানা জাবেদ আলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বর্তমানে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণঃ

দেশে ফেরার পর মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহা জাতিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমৃত্যু সাধনা করে গেছেন তিনি। পরিণামে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু থেমে থাকেননি কখনো।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) পাবনার বাঁশবাজার জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন স্থানে আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং প্রেস স্থাপন করেন, তখন অনতিদূরে কৃষ্ণপুর মাদরাসায় মাওলানা আযহারী চাকুরীরত ছিলেন। এই সময় পাবনায় হিজরত কারী মাওলানা মাওলা বখ্‌শ নদভীও স্থায়ীভাবে পাবনায় বসবাস করছিলেন। শহরের শালগাড়িয়ার মাওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী তখন বাঁশবাজার জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী তাঁদের সবাইকে আহ্বান করে একই প্লাটফরম থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেন। মাওলানা আযহারী, মাওলানা নদভী এবং মাওলানা আনছারী এ সময় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা আযহারী সাংগঠনিক প্রায় সকল কমিটিতেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাত্র শিক্ষকতার সময়টুকু বাদে বাকী সময়টা এই আন্দোলনের জন্যই তিনি ব্যয় করতেন।

সংস্কারক মাওলানা আযীমুদ্দীনঃ

মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ছিলেন একজন সুনিপুণ সংস্কারক। দেশে ফিরে কাল বিলম্ব না করেই তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। নিজেকে একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর নিম্নোক্ত অভিযান গুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।-

১. ঈদের ছালাত মাঠে আদায়ের অভিযানঃ তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর নিজ গ্রাম বাদুড়িয়া, পার্শ্ববর্তী জামিরা, জয়পুর, গোবিন্দপুর, পাশুন্ডি, চককাপাসিয়া, আগলা, শ্রীখণ্ড, ইউসুফপুর, দুর্লভপুর, জোত ভাগিরতপুর প্রভৃতি আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে লোকেরা জুম'আ মসজিদেই ঈদের ছালাত আদায় করে থাকে। তিনি প্রথমেই এটা বন্ধের প্রচেষ্টা চালান এবং কামিয়াব হন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে জয়পুর এবং বাদুড়িয়া গ্রামের মাঝখানে প্রায় ১০ বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করে একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একমাত্র জামিরা ব্যতীত উপরোক্ত সকল গ্রামের মুছল্লীরা এই ঈদগাহ মাঠে আজও ঈদের ছালাত আদায় করছেন। তাঁর এই আন্দোলনের মাধ্যমেই ঈদের আনন্দ জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠে।

২. নির্ধারিত সময়ে ফিৎরা আদায়ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ঈদের ছালাতের পূর্বেই ফিৎরা আদায়ে তিনি কঠোরতা আরোপ করেন এবং সকলকে সময়মত ফিৎরা আদায়ে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করেন। যারা ছালাত ও ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে তিনি কাফফারা নির্ধারণ করেন। তেমনিভাবে ধূমপান সহ অন্যান্য অসামাজিক কাজের জন্য শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি চালু করেন। তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনের ফলে পুরো সমাজ একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর সমাজে পরিণত হয়।

৩. পরধর্মে সহিষ্ণুতাঃ তিনি অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারেও বিশেষ নযর দেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ফুদকীপাড়া, ঘোষপাড়া ও

ইউসুফপুরের হিন্দু অধিবাসীদের সাথে প্রায়শঃ মুসলমানদের ঝগড়া হ'ত। তিনি কঠোর নির্দেশ জারী করলেন যে, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের উপর কোন প্রকারের যুলুম ইসলাম বিরোধী কাজ। তাঁর এ নির্দেশে জাদুমন্ত্রের মত কাজ হ'ল। যাবতীয় অনাচার বন্ধ হ'ল। হিন্দুরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল এবং মাওলানা আযহারীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

৪. পীরপূজার বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদানঃ

মাওলানা আযহারীর সংস্কার আন্দোলনে সাড়া না দিয়ে এতদঞ্চলের সবচেয়ে বড় আহলেহাদীছ গ্রাম জামিরার মাওলানা যাকারিয়া তাঁর বাড়ী সংলগ্ন জুম'আ মসজিদেই ঈদের ছালাত আদায় করতে লাগলেন এবং পীর-মুরীদি অব্যাহত রাখলেন। মাওলানা আযহারী পীর পূজার বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানেন। তিনি একে নাজায়েয এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিপন্থী কাজ বলে ফৎওয়া দেন।

৫. শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনঃ

মাওলানা আযহারী ছিলেন শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন। কবর, মাযার প্রভৃতিতে মানত, নযর-নিয়ায প্রদান ও মীলাদ-ক্বিয়াম এর বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি প্রচলিত ফিক্বহ শাস্ত্রের ফৎওয়াকে নাকচ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে ফৎওয়া দিতেন। ফলে দূর-দূরান্তের বহু লোক দলে দলে এসে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে যেত।

৬. গ্রামভিত্তিক একটি জুম'আ মসজিদ ও মসজিদে মসজিদে মক্তব চালুঃ

চল্লিশ দশকের শেষ দিক থেকে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বাদুড়িয়া ও আশ-পাশে একই গ্রামে একাধিক জুম'আ মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা হ'ত। তিনি এক গ্রামে একাধিক জুম'আ মসজিদের বদলে মাত্র একটি করে জুম'আ মসজিদ করার আহ্বান জানান। এতে সাড়া দিয়ে প্রায় গ্রামেই একটি করে জুম'আ মসজিদ করা হয়। ফলে পাড়ায় পাড়ায় মতানৈক্য ও দলাদলি প্রশমিত হয় এবং সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মসজিদে ছোট ছোট মাদরাসা চালুরও ব্যবস্থা করেন। ফলে গ্রামের অভাবী জনগণও তাদের ছেলে-মেয়েদের কুরআন-হাদীছের জ্ঞান দানে সক্ষম হয়। অনেক গ্রামে রাতের বেলায় বয়স্কদের কুরআন-হাদীছ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

৭. পানি সংকট দূরীকরণঃ

শুধু ধর্মীয় সংস্কারই নয় বরং জনকল্যাণমূলক কাজেও মাওলানা আযহারী ছিলেন অনন্য। পানি সংকট দূরীকরণে পুকুর খনন, কূয়া এবং টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতেন। ফলে অনেক গ্রামের দীর্ঘদিনের পানি সংকট দূরীভূত হয়।

অসুস্থতা ও নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তনঃ

১৯৬২ সালে দিনাজপুরের আকরগ্রাম মাদরাসায় চাকুরী রত অবস্থায় তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর শরীরের বাম দিকে প্যারালাইসিস হয়ে যায়। চিকিৎসার পর কিছুটা আরোগ্য লাভ করলেও স্বাভাবিক জীবন আর ফিরে পাননি। লাঠিতে ভর করে হাঁটা চলা করতে পারতেন। এ অবস্থায় তিনি নিজ গ্রাম বাদুড়িয়ায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু এমন সাংঘাতিক অসুখও তাঁর মনোবল কেড়ে নিতে পারেনি। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বাদুড়িয়া গ্রামের পুরোনো মাদরাসাটিকে একটি আদর্শ মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন।

মৃত্যুঃ

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তিনি আস্তে আস্তে সুস্থতা লাভ করতে থাকেন। ১৪ই আগস্ট ১৯৬৯ সালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হবে স্থির হয়। কিন্তু ঐ দিনই তিনি পুনরায় অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন এবং বড় ছেলেকে তিনি সাংসারিক সকল দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। অতঃপর ঐদিনই রাত সাড়ে ৯-টায় তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হে ও ইন্না ইলায়হে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

রচনা ও পাঠাগারঃ

মাওলানা আযহারী বাংলা ভাল বলতে পারলেও তেমন লিখতে পারতেন না। শেষ জীবনে উর্দূতে একখানা বই রচনা করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি এখন পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতে বহু কেতাব সঞ্চিত ছিল। যেমন মিশকাত, মুওয়াত্ত্বা মালেক ও কুতুবে সিত্তাহ ছাড়াও, হাদীছের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেমন ফাৎহুল বারী, তুহফাতুল আহওয়াযী, আউনুল মা'বূদ প্রভৃতি গ্রন্থ, তাফসীরে ইবনে জারীর, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, কাশশাফ, বায়যাভী, জালালায়েন, তাফসীরে ছানাঈ, তাফসীরে কালামুর রহমান ইত্যাদি। ফিক্হ গ্রন্থের মধ্যে মুনিয়াতুল মুছাল্লী, হেদায়া, শরহে বেকায়া, কানযুদ দাক্বায়েক্ব, শামী, আলমগীরী প্রভৃতি কেতাব ছাড়াও ইলমে ছারফ, নাহু, বালাগাত, মানতেক ও লোগাত এবং গোলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, সেকান্দার নামা প্রভৃতি ফারসী কেতাব সমূহ সহ ৭৪ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও প্রায় সব কিতাবই তাঁর আলেম ছাত্রদের কাছে চলে গেছে।।